৩৩

কণ্টক গাড়ী[১] কমল-সম পদতল
মঞ্জীর[২] চীরহি[৩] ঝাঁপি।
গাগরি-বারি[৪] ঢারি[৫] করি পীছল[৬]
চলতহি অঙ্গুলি চাপি[৭]।।

মাধব তুয়া অভিসারক[৮] লাগি।
দুতর পন্থ[৯]- গমন ধনি সাধয়ে[১০]
মন্দিরে[১১] যামিনী জাগি।।
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে[১২]।
কর-কঙ্কণ-পণ[১৩] ফণিমুখ-বন্ধন[১৪]
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে[১২]।।
গুরুজন-বচন বধির সম মানই[১৬]
আন[১৭] শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী[১৮] সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ[১৯]।। —গোবিন্দদাস

১। পুঁতে; ২। নূপুর; ৩। বস্ত্র দিয়ে। কমলের (পদ্ম) ন্যায় কোমল-সুন্দর পায়ের নূপুর বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে—নূপুরের শব্দ হয় এ আশঙ্কায়। প্রিয়তমের বংশীধ্বনি শ্রবণে যখন যাত্রা করতে হবে, তখন হয়তো কণ্টকময় পথে চলতে হবে। তাই শ্রীমতি অঙ্গনে কাঁটা পুঁতে কণ্টকময় পথে চলার অভ্যাস করছেন। ৪। জল (কলসির জল); ৫। ঢেলে; ৬। পিচ্ছিল; ৭। পিচ্ছিল পথে পদাঙ্গুলি চেপে হাঁটা অভ্যাস করছেন শ্রীমতি, যদি বর্ষাভিসারে যেতে হয়; ৮। মাধবের কাছে অভিসারের জন্য; ৯। দুস্তর পথ; ১০। অভ্যাস (সাধনা) করছে; ১১। গৃহে; রাত্রে গৃহে জেগে থেকে শ্রীরাধা প্রিয়মিলনের জন্য এই অভ্যাসগুলি করছেন; ১২। অন্ধকারে যদি যাওয়া-আসা করতে হয়, তা শেখবার জন্য, আঙুল দিয়ে চোখ বন্ধ করে, তা অভ্যাস করছেন; ১৩। হাতের কঙ্কণ পণ দিয়ে অর্থাৎ, পুরস্কারস্বরূপ দান করে। ১৪। সাপের মুখ কীভাবে বন্ধ করতে হয়, তার কৌশল। যাতে সাপ কামড়াতে না পারে। ১৫। সাপের গুরু অর্থাৎ ওঝার কাছে শ্রীমতি সেই শিক্ষা নিচ্ছেন। ১৬। কালার মতো শুনতে পাচ্ছেন না; ১৭। অন্য। বধিরের মতো গুরুজনদের এক কথা শুনে, অন্য উত্তর দিচ্ছেন; ১৮। নির্বোধ; মুগ্ধ > মুগধী; ১৯। সাক্ষী; প্রমাণ > পরমাণ; গুরুজনদের কথা শুনে বোকার মতো হাসছেন।

অভিসার

আমরা ভূমিকায় (''রাধাকৃষ্ণ লীলার পালা-পর্যায়'') বলেছি, পথের বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সংকেত-কুঞ্জে শ্রীরাধিকার যে গোপনযাত্রা, বৈষ্ণব সাহিত্যে তাকেই বলে অভিসার। সাধারণভাবে 'অভিসার' বলতে আমরা বুঝি নায়কের প্রতি অনুরাগবশত নায়িকার সংকেত-স্থানে গমন করা, অথবা নায়িকার প্রতি অনুরাগবশত নায়কের সংকেত-স্থানে যাত্রা। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলিতে আমরা নায়িকার 'অভিসার' পদেরই প্রধান্য দেখি। বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা 'অভিসারিকা' বলতে বুঝি নায়িকার অভিসার-যাত্রা, অথবা নায়ককে অভিসার-যাত্রা করানো।

বৈষ্ণব পদাবলিতে অভিসার-যাত্রার আটটি রূপ বর্ণনা করা হয়েছে—জ্যোৎস্না, তামস, বর্ষা, দিবা, কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, সঞ্চরা ও উন্মত্তা। এই পদগুলির একটি আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা পদগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। অভিসারের মধ্যে মিলনের প্রত্যাশায় নায়িকার বিপদবরণ, দুর্জয় সাহস ও দুঃখকষ্ট ভোগের একটা ব্যঞ্জনা রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধার আকুলতা ও গৃহকর্মের বাধাকে উপেক্ষা করে, লোকলজ্জা ও নিন্দাকে উপেক্ষা করে, প্রিয়মিলনের উদ্দেশ্যে যাত্রা অভিসার পদগুলিতে বিশেষ তাৎপর্য ও রোমান্টিকতা দান করেছে। ঈশ্বরের আহ্বান ইঙ্গিতে শুনে ঈশ্বরের অন্বেষণে যাত্রা-ই তো অভিসার! সংসারের মোহবাসনায় আমরা মত্ত হয়ে আছি বলে, সে আহ্বান শুনেও শুনছি না। কিন্তু যার কানে সে আহ্বানের গভীরতা একবার সাড়া তুলেছে, যার মন সেই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য তৈরি, সব-কিছু জাগতিক লাভ-ক্ষতিকে উপেক্ষা করে—সেটাই হবে মানবাত্মার অভিসার-যাত্রা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। বৈষ্ণব পদাবলির অভিসার হচ্ছে পরমাত্মার উদ্দেশ্যে জীবাত্মার অভিসার-যাত্রা—স্বকীয়া সংসারে থেকে পরকীয়ার জন্য আকুলতা।

অভিসারের জন্য নিজের মনকে তৈরি রাখতে হবে। ঈশ্বর যে কখন কাকে আহ্বান জানাবেন, তার তো স্থিরতা নেই। তাই যখন সেই বাঁশির আহ্বান কানে এসে প্রবেশ করবে, তখন সব-কিছুকে তুচ্ছ করে ছুটে যেতেই হবে! তাই তো প্রস্তুতি! তাই তো সাধনা! শ্রীরাধার অভিসার-যাত্রার জন্য প্রস্তুতি বা সব রকম বাধা অতিক্রমের শিক্ষা গ্রহণ করতে তো হবেই। সব রকমের বাধাকে অতিক্রম করতে না পারলে সেই পরমপুরুষের সঙ্গে মিলন কী সম্ভব?

বৈষ্ণব পদাবলিতে গোবিন্দদাসের অভিসার-বিষয়ক পদ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন বাধাকে অতিক্রম করার দুর্জয় তপস্যায় রাধার আচরণের চিত্র পদকর্তারা বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানদাস ও রায়শেখরের কয়েকটি পদও চিত্রধর্মিতায় ও নীতিধর্মে সার্থক। শুধু কী ভক্ত? ভক্তকে না পেলে ভগবানেরও উপায় নেই! তাই আকুলভাবে সব বাধা উপেক্ষা করে যাত্রার ফলে ভগবানও ভক্তের জন্য প্রতীক্ষারত।

কণ্টক গাড়ী কমল-সম পদতল...

পদকর্তা গোবিন্দদাসের অভিসার-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পদগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। বর্ষণমুখর রাত্রে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শোনা গেলে, তখন হয়তো কণ্টকময় পথে চলতে হবে, এই কারণে, আঙ্গিনায় কণ্টক পুঁতে, কমলের (পদ্ম) ন্যায় কোমল-সুন্দর পদযুগল, বস্ত্রে আবৃত করে,—পাছে নূপুরের শব্দ হয়, এ-আশঙ্কায়—পথ চলা অভ্যাস করছেন শ্রীরাধা। কণ্টকময় পথে চলার জন্য তাঁর চরণপদ্মকে সহনশীল করে তুলছেন শ্রীরাধা। ভরা বাদলে যদি পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথে তাঁকে যেতে হয় (জানি না, কখন তাঁর আহ্বান সংকেত তিনি শুনবেন!), তাই কলসির জল আঙ্গিনায় ঢেলে পথ পিছল করে, পদাঙ্গুলি চেপে চেপে চলার অভ্যাস করছেন শ্রীমতি। হে মাধব! হে মাধব! তোমার কাছে অতি দুস্তর পথে, কীভাবে অভিসার-যাত্রা করতে হবে, রাত্রি জেগে নিজ গৃহে, তারই সাধনায় রত আমি! শ্রীরাধা দু হাত দিয়ে চোখ ঢেকে পথ চলার অভ্যাস করছেন, যদি আঁধার রাতে অভিসারে বের হতে হয়! হাতের কঙ্কণ পুরস্কারস্বরূপ দান করে, তিনি সাপুড়ে বা ওঝার কাছ থেকে সাপের মুখ কীভাবে বন্ধ করতে হয়, তার কৌশল শিখছেন। অন্ধকার পথে যাতে সাপ না কামড়াতে পারে, তাই এই ব্যবস্থা। গুরুজনের কথা তিনি শুনেও শুনছেন না। বধিরের মতো, এক কথা শুনে, অন্য উত্তর দিচ্ছেন। পরিজনেরা যেসব কথা বলছেন, তা শুনে বিহ্বলা বা নির্বোধের মতো হাসতে থাকেন শ্রীরাধা! আর পদকর্তা গোবিন্দদাস, এ অবস্থার সাক্ষী।

গোবিন্দদাস—আলোচ্য পদটি কবির অন্যতম উল্লেখযোগ্য পদ। এতে পদকর্তার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শ্রীচৈতন্যের প্রতি আত্মনিবেদন ও ভক্ত-চিত্তের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"বৈদ্যবংশোৎপন্ন গোবিন্দদাস কবিরাজ (কৌলিক উপাধি সেন) বিচিত্র কবি-প্রতিভা, বিস্ময়কর কারুনির্মিতি, উদ্বেল আবেগ এবং অচিন্তিতপূর্ব বাক্‌পুঞ্জের দ্বারা ধ্বনিকেন্দ্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য,...সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, ভক্তগোষ্ঠী এবং রসিক সমাজে...শ্রদ্ধার্হ আসন লাভ করিয়াছেন।"

গোবিন্দদাসের মাতামহ দামোদর সেন কাটোয়ার নিকট শ্রীখণ্ডে বাস করতেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ধর্মমতে তিনি নাকি শাক্ত ছিলেন। গোবিন্দদাসের পিতা চৈতন্য-ভক্ত চিরঞ্জীব সেন কিছুদিন শ্রীখণ্ডে বাস করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের স্নেহধন্য ছিলেন। তাই ধর্মমতে তিনি নিশ্চয়ই বৈষ্ণব ছিলেন। মাতামহের শাক্ত মত গোবিন্দদাসকে প্রথম পর্বে প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু পিতা বৈষ্ণবভক্ত

ছিলেন বলেই হয়ত মাতামহের আশ্রয় ত্যাগ করে পিতার সঙ্গে তিনি গ্রামান্তরে যান। তবে পিতার অকালমৃত্যুর পর গোবিন্দদাস বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে শ্রীখণ্ডে আবার মাতামহের আশ্রয়ে আসেন। "গোবিন্দদাস বোধ হয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে তিরোহিত হন।" তাঁর পত্নীর নাম মহামায়া, পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। একবার কঠিন উদরাময় সংক্রান্ত রোগে মরণাপন্ন গোবিন্দদাস শ্রীনিবাসের কৃপায় নিরাময় হন এবং সপরিবার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন।

কবি বা পদকর্তা হিসাবে তাঁকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয়। তা সত্ত্বেও তাঁর অপূর্ব পদাবলি আন্তরিকতায়, অলংকরণে ও ভাবসম্পদে সমগ্র বৈষ্ণবসমাজকে মুগ্ধ করেছিল এবং বৈষ্ণবসমাজে তিনি ও তাঁর অগ্রজ, দুজনেই যথেষ্ট সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

তিনি কমবেশি আটশো পদ রচনা করেন। একাধিক গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত কবির অস্তিত্ব থাকায় মূল কবির অনেক পদ এইভাবে পাঠককে বিভ্রান্ত করে। তবে মূল গোবিন্দদাসের পদে বিদ্যাপতির অনুসরণ, ভাষা ও অলংকারের ঐশ্বর্য অন্য পদকর্তাদের থেকে তাঁকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে। গোবিন্দদাসের কবিত্ব সম্পর্কে আমরা ভূমিকায় ('বৈষ্ণব পদকর্তাদের কবিকৃতি' দ্রষ্টব্য) আলোচনা করেছি। গোবিন্দদাসের পদগুলির সংকলনে রাধাকৃষ্ণলীলার একটা ক্রম-বিন্যাস লক্ষ করা যায়। কীর্তনীয়া-সমাজ তাই গোবিন্দদাসের পদাবলিকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন এবং শ্রোতারাও আনন্দ পেতেন বেশি। এর কারণ যেমন তাঁর কবিত্ব, তেমনই তাঁর কাহিনিগত ধারাবাহিকতা।

কবিত্বের বিচারে কারও মতে বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠ। আবার কেউ বলেন, গোবিন্দদাস পণ্ডিত, কিন্তু নিরাভরণভাবে প্রাণের কথা বলতে চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের তিনি সমকক্ষ নন। তাই পণ্ডিত সমালোচকের মতে—"তাঁহার পদের রসাস্বাদন করিতে হইলে শুধু সহজ রসবোধ থাকিলেই চলিবে না, তাহার সঙ্গে একটি তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন বিদগ্ধ মনও প্রয়োজন।...গোবিন্দদাস বিচিত্র ভাবৈশ্বর্য, রূপকল্প ও রাধাকৃষ্ণ চরিত্র উপস্থাপনে বিশিষ্ট প্রতিভার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিদ্যাপতি অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে...সূক্ষ্ম ভাবের ব্যঞ্জনা আবেগানুসারে যে কী পরিমাণে চিত্র-সঙ্গীতময় হইতে পারে, তাহার অসংখ্য নিদর্শন গোবিন্দদাসের পদাবলীর সর্বত্র ছড়াইয়া আছে।"